ভ্রমণ

নীলমাধব

শ্রীশুভ

আমার উড়িষ্যা সম্পর্কে দুর্বলতার কথা আমার পরিচিতরা সবাই জানে। এই দুর্বলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে যাওয়া নিছক বাগাড়ম্বরতা। তবে এইটুকু বলি, বর্তমান সময়ে ভ্রমণ যথেষ্ট অর্থ সাপেক্ষ। পেশায় নিযুক্ত হয়ে প্রথমতঃ সময়ের অভাব হয়ে পড়ে। তারপর সমস্ত শখ পূরণ করে অর্থ সঞ্চয় করে বেরিয়ে পড়া আর তেমন হয়ে ওঠে না। একটা জীবনে সমস্ত পৃথিবী তো দূরে থাক, নিজের দেশটাই সম্পূর্ণ করতে পারবো না। তাই এই একটা রাজ্যকেই বেছে নিলাম। কেউ হয়তো বলেছিলেন 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভূ-ভারতে'। কথাটা সত্য। পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ নাকি ভারতবর্ষ।

কিন্তু গোটা ভারত আর ঘুরতে পারবো কিভাবে? তাই বাছলাম উড়িষ্যাকে। কারণ আমার মতে উড়িষ্যা ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

কেন?

পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, অরণ্য, বালুবেলা, মালভূমি, সমুদ্র, তীর্থস্থান, স্থাপত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, অভয়ারণ্য—ভ্রমণের যতরকম শর্ত সব বোধহয় পূরণ হয় এখানে। কেউ বলবেন তুষারসমৃদ্ধ স্থান কই উড়িষ্যায়?

মধ্য উড়িষ্যার দারিংবাড়িতে তুষারপাতের নজিরও আছে।

কম খরচে পাশের রাজ্যেই এতকিছু দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এবং সর্বোপরি জগন্নাথ।

একবার দেখলে মন ভরে না। শতবার দেখলে আবার মন করে দেখতে।

তাই উড়িষ্যা। বারে বারে ছুটে যাই সেখানে।

তেমনি একবার গেছিলাম পুরীতে।

অন্যদের মতো সমুদ্রস্নান আর জগন্নাথ দর্শন চারদিনে শেষ করে পালিয়ে আসার দলে আমরা নই। ভ্রমণের ভাষায় আমরা অত্যুৎসাহী এবং সেটা বেশ বেশি মাত্রাতেই। প্রধান দ্রষ্টব্য ছাড়া আনাচে কানাচে উঁকি মারার বদ অভ্যাস আমার আছে। বার বার পুরী যেতে যেতে জগন্নাথদেবের উৎপত্তি রহস্য আমার জানা। প্রথমে তিনি গুপ্তভাবে শবররাজ দ্বারা পূজিত হতেন এই উৎকলেরই কোনো এক দুর্গম অরণ্যময় গিরিগুহায়। জগৎবাসীর কাছে প্রকট হইবার জন্য তিনি বর্তমান হস্তপদবিহীন কাষ্ঠমূর্তিতে প্রকট হয়েছেন। সে এক বিস্তর অন্য কাহিনি।

অন্যবারের মতো পুরীতে দ্বিতীয়দিনে সন্ধ্যাবেলায় ভারত সেবাশ্রমের গোপাল মন্দিরের সামনে অটো স্ট্যান্ডে একটা অটোর ভেতর রবি এবং অন্যদের সাথে আড্ডা মারছিলাম।

রবি পুরীর ছেলে। এই স্ট্যান্ডে অটো চালায়। কোনো একবার আমরা ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম পুরীতে। সেইবারই রবির সাথে আমাদের প্রথম আলাপ। রবি সাহায্য করেছিল আমাদের। সেই থেকে ওর সাথে সত্যিই আমাদের আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যায় রবি হঠাৎ নীলমাধবের কথা তুললো। সে জানালো জগন্নাথ রূপে প্রকট হলেও এখনো নীলমাধব নাকি পূজিত হচ্ছেন উড়িষ্যার কণ্টিলো নামক স্থানে।

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

রবিকে বললাম—নিয়ে চলো।

রবি বলল—দূর। সে কি এখানে? পুরী থেকে আপ-ডাউন প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার। অটো করে সম্ভব নাকি? আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তোমরা ঘুরে এসো। মন্দির ছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখার মতো।

কিন্তু আমার মন মানলো না।

রবি আমাদের ভীষণ ভরসা। ওর অটোতে ঘুরি ঠিকই, কিন্তু ওকে শুধু আমাদের বাহনচালক বলা যায় না। ও আমাদের বন্ধু। তাছাড়া ও সাথে থাকলে আমাদের অনেক সুবিধা। সর্বোপরি ও ওড়িয়া, ভাষাটা বুঝলেও সবক্ষেত্রে তা সাবলীল নয়।

আমি গোঁ ধরলাম, গেলে তোমার অটোতেই যাবো।

রবি জানতোও সে কথা। মুচকি হেসে বলল—তবে কাল ভোর সাড়ে তিনটেয় রেডি হয়ে থেকো। আমি তোমাদের হলিডে হোমের সামনে পৌঁছে যাবো, যথা সময়ে।

আমরা আর বেশিক্ষণ গ্যাঁজালাম না।

তাড়াতাড়ি হলিডে হোমে ফিরে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোর তিনটের সময় উঠে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিলাম।

অচেনা পথ। কোথায় স্নানাহার করবো জানি না।

সাড়ে তিনটে বাজল। ক্রমে ঘড়ির কাঁটা এগোতে লাগল কিন্তু বাইরে কোনো শব্দ নেই। শীতকাল। এতো ভোরে হলিডে পাড়ার রাস্তাটা (গৌরবাট সাহী) খাঁ খাঁ শুনশান। রবি বলে দিয়েছিল সাড়ে তিনটেয় বের হলে তবে সন্ধ্যা সাতটায় আবার আমরা পুরীতে ফিরে আসতে পারবো, নীলমাধব দেখে। দেরি হচ্ছে দেখে আমরা ঘরে একবার, দোতলার বারান্দায় একবার পায়চারি করতে লাগলাম এবং অবশেষে ঘরের খাটে এসে বসে পড়লাম ভগ্ন মনোরথ হয়ে। রবির নানাভাবে মুণ্ডুপাত করতে লাগলাম। ধরেই নিলাম রবি ঘুম থেকে ওঠেনি বা ভুলে গেছে আমাদের বেরোনোর কথা। ওর আবার শুকনো নেশার সু-অভ্যাস আছে। কথায় কথায় দূর দূর করতে করতে আমরা অন্য দুজন সঙ্গীর সাথে অবশেষে সমুদ্রপাড়ে সূর্যোদয় দেখার পরিকল্পনা করলাম।

এমন সময় একটা অটোর এদিকে আসার শব্দই শুনলাম যেন। দৌড়ে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে দেখি রব্যুদয় হয়েছে। অটো নিয়ে মূর্তিমান আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। দোতলা থেকে গালাগাল দিলাম বেশ কতক। সে সব গায়ে না মেখে একগাল হাসি নিয়ে রবি বলল—কি করবো? কাল ঘোড়োনাচ ছিল পাড়ায়। তাই দেখে শুয়েছি মাত্র দুঘণ্টা আগে। যাক্, বেশি দেরি হয়নি। চলো চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।

নীচে নেমে দেখলাম অটোতে ভাগিনা বসে রয়েছে।

এর আসল নাম আমি এখনো জানি না। সম্পর্কে ভাগ্নে না হলেও অটোস্ট্যান্ডে সবাই ওকে ভাইগ্না বলে ডাকে। এরও অটো আছে।

রবি বলল—এতটা পথ আমি একা ড্রাইভিং করবো কি ভাবে?

গাড়ি ছুটলো।

স্বর্গদ্বার হয়ে বড় মন্দিরের সামনে এসে স্পিড কমালো রবি। সিংহদরজা খুলেছে। অত শীতেও জগন্নাথের সেবক ও দর্শনার্থীরা মন্দিরে যাওয়া-আসা করছে। রবি নীচু হয়ে নমস্কার করলো। আকাশ তখন ফর্সা হয়ে আসছে। অটো থেকে নেমে রবি পেট্রোল পাম্পের ছেলেটিকে বলল—ফুল ট্যাঙ্ক। সেই সুযোগে আমিও নেমে একটা দোকান থেকে কুড়িটা গুন্ডি (উড়িষ্যার তৈরি দোক্তাপাতা সম্বলিত একপ্রকার সুস্বাদু জর্দা) পান কিনলাম। মূলতঃ আমি পান খাই না। কিন্তু উড়িষ্যার বর্ডার পেরোলেই আমি পান চিবোনো শুরু করি। গুন্ডি আমার ভীষণ পছন্দের।

তেল ভরে পুরী জেলের সামনের রাস্তা দিয়ে আমরা একটা তিনমাথায় এসে পৌঁছলাম। বাঁদিকের রাস্তাটা আলাল্নাথ হয়ে সাতপুরা চিল্কার দিকে গেছে। ডানদিকেরটি আঠারোনালা পেরিয়ে ভুবনেশ্বরগামী। অটো ডানদিকে ভুবনেশ্বরের দিকে দৌড়ালো।

আট কিলোমিটার যেতেই মা বাট মঙ্গলার মন্দির। ছোট্ট হলেও এদেশের পথচারীরা এই দেবীকে খুবই মান্য করে। এদের বিশ্বাস এই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে চললে পথে বিপদ আসে না। (ওড়িয়া শব্দানুসারে বাট্ কথার অর্থ পথ বা রাস্তা। পথের মঙ্গলের নিমিত্ত দেবী মা বাট্ মঙ্গলা)।

রবি সেখানেও খানিক দাঁড়িয়ে মাকে প্রণাম সেরে আবার রওনা দিল।

সোজা রাস্তা, চারিদিকে হরিয়ালি।

এই পথের বিশেষত্ব এই পথের দুধারে ছোট ছোট অনেক মন্দির। সে সবের বিবরণে প্রবন্ধ বৃহৎ হবে।

পথে একে একে চন্দনপুর, সাক্ষীগোপাল মোড় হয়ে ত্রিশ কিলোমিটার পর এসে পৌঁছলাম পিপ্লিতে। এখানে রাস্তা চারদিকে ছুটেছে। পিছনে পুরী, সামনে ভুবনেশ্বর, ডাইনে কাকতাপুর হয়ে কোনারক এবং বাঁয়ে খুরদা। আমাদের অটো খুরদার রাস্তা ধরল। এখান থেকে রাস্তার মসৃণতা আস্তে আস্তে বন্ধুর হতে শুরু করল। এ রাস্তাতেও ক্ষান্তি নেই। দুধারে প্রাচীন ছোট মাঝারি মন্দিরের সারি।

চলতে চলতে একঘণ্টা।

যাতনী হয়ে খুরদা শহরে এসে পৌঁছলাম। জমজমাট শহর তখন নতুন দিনের কর্মব্যস্ততার মহড়া দিচ্ছে। যানজট শুরু হয়ে গেছে। অটোর গতি স্বভাবতঃ কম করতে হল। একটা বাজার মতো জায়গা দিয়ে যাবার সময় দেখলাম লাট্ লাট্ কমলা গামছার পর্বত।

রবি অটো চালাতে চালাতে সেগুলো দেখিয়ে বলল—তোমরা পুরী এসে যে গামছা কিনে নিয়ে যাও, সেগুলো

আসলে এখানে তৈরি হয়। আসলে এগুলো খুরদার গামছা। লোকে পুরী থেকে কেনে বলে, পুরীর গামছা বলে। জানো সারা দেশে, এমনকি বিদেশেও এর চাহিদা আছে।

জানলাম, চললাম।

বেশ খানিকক্ষণ কসরতের পর শহর ছাড়িয়ে আবার হাইরোড ধরল আমাদের গাড়ি।

রবি বলল—দুধারে দেখতে থাকো। শুধু পাহাড়ের সারি দেখতে পাবে।

দেখলাম সত্যিই মনোরম দৃশ্য। দূরে একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় সাদা একটা মন্দির দেখতে পেলাম। দূরে ছোট দেখালেও মন্দিরটা খুব ছোট নয় বুঝতে অসুবিধা হয় না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ওটা খুরদার একটা বিখ্যাত শিবমন্দির।

দুধারের দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে, চলন্ত অটোয় বসে শীতের হাওয়া খেতে খেতে চলছিলাম। হঠাৎ মনে হল অটোটা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই ঝাঁকানি খাচ্ছে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি রাস্তাটা পাথুরে। ভূপ্রকৃতি বুঝতে দেরি হল না। কোনো এক আদিম যুগে এসব অঞ্চলে পাহাড় ছিল। ক্রমে সমতলে পরিণত হয়েছে।

শীতের ছোঁয়ায় চায়ের পিপাসা পেয়েছিল, অনেক আগে থেকেই। রবিকে চায়ের দোকান দেখে দাঁড় করাতে বললাম।

পনেরো মিনিট যাবার পর দুটো গুমটি দোকান চোখে পড়ল। রবি সেখানে গাড়ি দাঁড় করালো।

আমরা নামলাম অটো থেকে।

চারদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরে পাঁচ-ছটা উঁচু উঁচু পাহাড়, গাছগাছালি ক্ষেতখলিয়ান—যেন কোন শিল্পীর হাতে আঁকা নিখুঁত ল্যান্ডস্কেপ। কিন্তু দূর দিগন্তেও কোনো গ্রাম চোখে পড়ল না। তাহলে এই দোকান দুটি নিশ্চয়ই আমাদের মতো পথচারীর জন্য। আমরা দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। দোকানি সবেমাত্র চায়ের জল বসিয়েছে উনুনে। চারদিকের হালকা কুয়াশা, নিজেদের মুখ থেকে বের হওয়া ভাপ্ আর দোকানদারের উনুনের ধুঁয়ো মিলেমিশে একাকার। মোবাইল বের করে দেখলাম সবে সাতটা পনেরো।

রবি তাড়া দেবার সুরে বলল, তাড়াতাড়ি নিতে। আমরাও তাড়াতাড়ি চা পর্ব শেষ করে আবার গাড়িতে উঠলাম। অটো আবার চলতে থাকল।

রবি খুব পাকা ড্রাইভার। পথের উঁচু নীচু সামলে চালাচ্ছিল গাড়ি। কিন্তু একটা ছোট্ট জনপদের কাছে এসেই বিকট্ একটা আওয়াজ হল গাড়িতে।

প্রথমে বুঝিনি, অটো দাঁড়াল রাস্তার সাইডে।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম ডানদিকের পিছনে চাকাটি কোনো পাথরের আঘাত সইতে না পেরে চিৎকার করে উঠেছে।

রবি বলল—ঘাবড়িও না। পিছনে টায়ার আছে।

রবি আর ভাইগ্না মিলে চাকা চেঞ্জ করতে লাগল। আমি আর আমার দুজন সঙ্গী জনপদটার দোকান পসরা দেখতে থাকলাম। হঠাৎ মনে হল ব্রেকফাস্টটা করে নেওয়াই ভালো, যা হয় ভালোর জন্যই হয়।

এখানে বলে রাখি, আমার দুজন সঙ্গী একেবারেই ভ্রমণপিপাসু নয়। তস্য ভ্রমণবিরোধী ও ঘরকুনো। একপ্রকার মানুষের দল আছে যারা পথেও নিজেদের ঘরের সুখ চায়। এরা দুজনেই সেই দলে। (সেটা এই ভ্রমণে বুঝেছিলাম)।

আমি আমার একটা সঙ্গীকে বললাম—চল, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্ এই ফাঁকে।

একে অত ভোরে সুখশয্যা ছাড়তে হয়েছে, তারপর এই পথচলা। আমার শীতকাতুরে আগন্তুক সঙ্গীটি মুখ বেঁকিয়ে বলল—কি খাবো?

আমি বললাম—চল না দেখি।

জনপদটায় তেমন খাবার দোকান দেখতে পেলাম না।

তবু আমি একাই একটু এগিয়ে গেলাম। দেখি, একটা তেলেভাজার দোকানে গরম ঝুড়িভাজা, গাঁঠিয়া ভাজছে। উড়িষ্যার লোকেরা তেলেভাজা প্রভৃতি খাদ্য দিয়ে প্রাতঃরাশ সারে। আমার মতে, সে দেশে লোকেরা যা করে ভ্রমণকালে ভিনদেশীদেরও তাই করা উচিত। কারণ জলবায়ুর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে গেলে তাদের মতো নিজেকে গুছিয়ে নিতে হয়। আবার, আমি দেখেছি বিদেশবিভুঁই-এ তাদের মতো নিজেকে তৈরি করে নিলে সেই দেশটা তার সমস্ত গুণাগুণ নিয়ে যেন আলিঙ্গন করে বিদেশীকে। ট্যুরিস্ট ট্যুরিস্ট ব্যাপার নিজের মধ্যে থাকলে বুড়ি ছোঁয়ার মতো ঘুরতে হয় ভ্রমণার্থীকে। সে ক্ষেত্রে গন্তব্য ও দ্রষ্টব্যের অন্দরমহলে পৌঁছে ওঠা যায় না। যাই হোক, আমি সঙ্গে সঙ্গে দামদর করে আড়াইশ গ্রাম ঝুড়িভাজা কিনলাম। ঠোঙা ধরা যাচ্ছিল না, এত গরম। আমার সঙ্গী দুজন পিছনে ঘোরাঘুরি করছিল। আমি ওদের ঠোঙাটা এগিয়ে খুব আগ্রহভরে খেতে সাধলাম। কিন্তু আমার কপাল খারাপ। সঙ্গী

দুজন টিপিক্যাল বাঙালিআনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বাঙলার এতো দূরে, বুঝতে দেরি হয়েছিল। তার মুখ নাক সিঁটকে মারমুখো হয়ে এমনভাবে আমার প্রতি তেড়ে এল, যেন তাদের এই সাতসকালে কোনো অখাদ্য-কুখাদ্য অফার করে ফেলেছি।

ওরা খেলো না দেখে আমিই খেতে শুরু করলাম।

এমন সময়ে রবি আর ভাইগনার ডাক এল, টায়ার লাগানো হয়ে গেছে।

আবার নবোদ্যমে আমরা চলতে শুরু থাকলাম।

খানিকক্ষণ বাদে অটো হঠাৎ বড় রাস্তা ছেড়ে একটা সরু মেঠো পথে ঢুকল।

রবি বলল—এটা বলিনি তোমাদের পথে এই আশ্চর্য জায়গাটা তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

রবির এটা স্বভাব। হঠাৎ সারপ্রাইজ দেওয়া।

রাস্তাটা এঁকে বেঁকে গ্রাম্যপথে দু'কিলোমিটার মতো ভেতরে ঢুকে একটা বেশ উঁচু জাল-পাঁচিল দেওয়া জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। আসতে গিয়ে রাস্তা শেষ হবার কিছু আগে বেশ বড় একটা সাদা মন্দির পথের বাঁদিকে রয়েছে। আমি ভাবলাম মন্দিরে না দাঁড়িয়ে মন্দির ছাড়িয়ে নিয়ে এল কেন রবি?

প্রশ্ন করতে হল না। অটো থামিয়ে, নেমে রবি বলল—এই জায়গাটার নাম অত্রি। ভেতরে চলো, দেখবে কুয়ার জল কেমন আপনা থেকেই ফুটছে।

আমি প্রায় লাফিয়েই উঠেছিলাম, বলতে পারা যায়, কারণ উড়িষ্যা সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে অত্রি হট্ স্প্রিং এর কথা আমার আগেই জানা ছিল। নীলমাধব দেখতে বেরিয়ে হঠাৎ এমন অবিশ্বাস্যভাবে এই স্থানটা আমাদের প্রাপ্তিতে এসে পৌঁছবে সেটা সত্যিই কল্পনার বাইরে।

খুব খুশি হলাম।

উঁচু জাল পাঁচিলটার কারণ খানিকবাদে বুঝলাম। ভেতরে ঢুকতে টিকিট লাগে। কিন্তু ততক্ষণে রবি পাঁচজনের টিকিট নিজের ট্যাক থেকে কেটে ফেলেছে। এটাও রবির স্বভাব। ওর সাথে বের হলে অর্ধেক খরচ পথে ওই করে। এখন বুঝি ও আসলে আমাদের যাত্রী বা টুরিস্ট ভাবতেই পারে না। ও বন্ধুদের সাথে এসেছে এটাই মনে করে।

টিকিট পাঞ্চ করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। একটা পার্ক। মোটামুটি সাজানো গোছানো। পার্কের ঠিক মাঝখানে একটা সাধারণ পাতকুয়ো। আর তার চারকোণে চারটে চৌবাচ্চা মতো কাটা রয়েছে। চারটেই জলে পূর্ণ।

আমরা এগিয়ে গেলাম।

আমার সঙ্গী দুজন চৌবাচ্চায় পা ডুবিয়ে ছবিও তুলল। আমি হাত দিয়ে দেখলাম সহ্য করার মতো গরম জল। শীতে বেশ আরামদায়ক।

রবি বলল—আসলে জল ফুটছে ওই মাঝের কুয়োটায়। কিন্তু ওই জল এত গরম যে ওটায় হাত ঠ্যাকানো যাবে না। তাই পাইপের সাহায্যে মেন কুণ্ড থেকে জল এনে এই কুণ্ডে ফেলা হয়। আমাদের সামনেই একটা অন্য লোক দেখলাম চার কুণ্ডের একটিতে নেমে স্নান করল। আমরা এগিয়ে গেলাম মাঝখানের কুয়োটার দিকে। পাশে একটা বয়স্ক ওড়িয়া লোক একটা ছোট টুলে বসে রয়েছেন। আমরা যেতেই কুয়ো এবং কুয়োর জল সম্বন্ধে বিজ্ঞান, প্রকৃতি এবং দেবতার মাহাত্ম্য সংমিশ্রিত করে ওড়িয়া ভাষায় নানা কাহিনি বলতে লাগলেন।

আমি কর্ণপাত তেমন করলাম না।

কারণ আমার মতে বিজ্ঞান, প্রকৃতি এবং দেবমাহাত্ম্য সবই একই বস্তুর নাম। যেগুলোর মানুষ কার্যকারণ খুঁজে পেয়েছে, তাকেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা নিজের কৃতিত্ব বলে। প্রকৃতিপ্রেমীরা প্রকৃতির খেলা বলে আর ধার্মিকেরা দেবমাহাত্ম্য বলে। অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণ গীতার ভগদদ্বাক্য ভুলে যায়। যেখানে ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে তিনিই এই প্রকৃতির নিয়ন্তা এবং প্রত্যেকটি বস্তুতে বর্তমান।

কুয়ায় মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, সত্যিই জল ফুটছে। বুদ্‌বুদ্ উঠে আসছে কুয়োর গভীর থেকে। জানি জলে সালফার রয়েছে তাই এই কুণ্ডের জল ফুটছে। কিন্তু ভগবদ্বাক্য মেনে এটা ধরে নিলে ক্ষতি কি যে সালফার ভগবানেরই সৃষ্টি একটা দ্রব্যবিশেষ, যা এই জলকে ফোটাচ্ছে।

যাক ভ্রমণকাহিনিতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে কাজ নেই। ধর্ম উপলব্ধিসাপেক্ষ বিষয় আর বিজ্ঞান প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়। কুয়ো দেখে চলে আসতে যাবো, টুলে বসে থাকা ওড়িয়া লোকটা একটা হাতা টাইপের পাত্রে আমাদের কুয়োর জল এগিয়ে খেতে বলল। সঙ্গে বোঝালো এই জলে অনেক পেটের রোগ সারে। অবশ্যই সারে, কারণ জলে সালফার রয়েছে। তবে সেটা এই একদিন এই এক চুমুক জলে সারবে না। দীর্ঘদিন খেলে সারবে। এ কথা তাকে না শুনিয়ে নির্বিবাদে লোকটার দেওয়া জল পান করলাম। আমার সঙ্গী দুজন চির রুগ্ন এবং রোগ রোগ

বাতিকগ্রস্ত। তারা দেখলাম বেশ ভক্তিভরে জলটা পান করল এবং হয়তো মনে মনে ভাবল এই জলপানে তাদের ইহজন্মের সমস্ত রোগ সেরে গেল।

দেখা শেষ। আমার মনে নীলমাধব যেন তাড়া দিচ্ছে। বলছে—আয়, এখনো তো অনেক পথ।

আমি সবাইকে তাড়া দিলাম।

সবাই আবার এসে উঠলাম অটোয়। রবি গাড়ি ছাড়ল।

সেই পথের পাশে মন্দিরটার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে রবিকে প্রশ্ন করলাম—ওটা কিসের মন্দির?

রবি বলল—শিবের। বাবা হটকেশ্বর।

আমি বললাম—দাঁড়াও দেখে যাবো।

রবি বলল—না, না। দেরি হয়ে যাবে, অনেক রাস্তা বাকি এখনো। তাছাড়া শিবের মন্দিরে আমি স্নান না করে ঢুকি না। আর আজ সকাল থেকে স্নান করিনি।

মন খারাপ হলেও উপায় নেই। গৃহে গৃহিণীর মতে চলা এবং পথে চালকের মতে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনে মনে বাবাকে বললাম, পরে দেখা দিও। পরের আর একটি যাত্রায় সত্যিই হঠকেশ্বর বাবাকে দর্শন করেছি। কিন্তু সে কাহিনি অন্য।

গ্রামের রাস্তা ছেড়ে আমরা আবার এসে পৌঁছলাম প্রধান সড়কে। খানিক যাবার পর আমার সঙ্গীটি বলল তার প্রাকৃতিক ডাক এসেছে। এই পথে ঘাটে এবার আমি কি করবো? রবিকে বললাম। রবি কোনো সাড়া দিল না। গাড়ি চলতে থাকল।

খানিকবাদেই একটা ছোট্ট গ্রাম এল। আর রবি সঙ্গে সঙ্গে অটো দাঁড় করিয়ে নেমে উধাও হয়ে গেল। আর তার খানিক পরেই ফিরে এল, সঙ্গে আমাদের বয়সীই একটি ছেলে। ছেলেটির মুখে হাসি। রবি পরিচয় করিয়ে দিল। এ নাকি রবির বন্ধু। ছেলেটি আমার সঙ্গীটিকে নিয়ে চলে গেল। আমি আর আমার এক সঙ্গী নামলাম। সামনে একটা বিশাল মাঠ। পুরো সবুজ হয়ে আছে। দুজনে মাঠে পায়চারী করতে লাগলাম। পেছন থেকে রবির গলার আওয়াজ শুনলাম।

—তোমরা যে মাঠে দাঁড়িয়ে আছো, জানো সে মাঠে ঘাস নেই।

ঘাস নেই? এত বড় সবুজ মাঠে ঘাস নেই? রবি বলে কি? আমি বললাম—ঘাস নেই তো এগুলো কি?

রবি বলল—নীচু হয়ে দেখো। ওগুলো ঘাস নয়। ঘাসের মতোই অন্য জিনিস। এই ঘাসের পাতা ছুঁলে কুঁকড়ে যায়।

শোনামাত্রই আমার মাথায় ঘুরে গেল। নীচু হয়ে দেখলাম সত্যিই পায়ের তলায় ঘাস নেই। ছোট্ট ছোট্ট গুল্মে সারা মাঠটা ভরা। আবার সেই গুল্মে ছোট্ট ছোট্ট বলের মতো সাদা আর হালকা গোলাপী ফুল ধরে রয়েছে। লজ্জাবতী! পাতায় হাত ছোঁয়াতেই কুঁকড়ে গেল। এত বড় প্রান্তর লজ্জাবতীর? সত্যিই আশ্চর্য। আমি বললাম—এ গাছ খুব মূল্যবান। বিশেষ করে এই সাদা ফুলওয়ালাগুলো। আমি নিয়ে যাবো।

রবি বলল—ধুস্। এমন এখানে প্রচুর পাবে। তুমি যা দেখো তাই নিয়েই লাফালাফি করো। এছাড়া এ গাছ নিয়ে যেতে যেতে মরে যাবে।

সত্যি কথা।

আশা ত্যাগ করলাম। ততক্ষণে আমার অপর সঙ্গীটি রবির সেই 'হঠাৎ' বন্ধুটির সঙ্গে ফিরে এল। চোখ মুখ দেখেই বুঝলাম হাল্কা হয়েছে।

রবি বিলম্ব করল না। বন্ধুটিকে বিদায় দিয়ে অটো ছাড়ল।

আমি বললাম—রবি এ কি তোমার পুরোনো বন্ধু? নাকি হঠাৎ পরিচয় করলে আমাদের জন্য?

রবি মুচ্‌কি হেসে বলল—সারা উড়িষ্যায় যেখানে যাও না কেন, আমার পরিচিত কেউ না কেউ থাকবেই। সে প্রমাণও আমি পেয়েছি, পরবর্তী সময়ে।

এবারে দেখলাম অটোর স্পিড্ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। রবি যেন ক্ষেপে উঠেছে। রাস্তার জন্য আমাদের জার্কিংও হচ্ছে মারাত্মক। কিন্তু অহেতুক সময় যেটা ব্যয় হয়েছে রবি সেটা যেন মেক্ আপ দিতে চাইছে। জার্কিং-এর কষ্ট ভুলতে আমি দু'ধারের দৃশ্যে মনোনিবেশ করলাম। দৃশ্য সাথও দিল। পাহাড়গুলো দূর দিগন্ত ছেড়ে পথের পাশে চলে আসতে লাগল। বুঝলাম বেশ পাহাড়ি এলাকা। বন জঙ্গলও খানিক রয়েছে।

রবির অটোর মাথায় লেখা ছিল—সাথী মা। সাথী মা ঝড়ের গতিতে দৌড়াচ্ছে। সামনে সোজা রাস্তা। আর রাস্তাটা গিয়ে শেষ হচ্ছে যেন একটা বিশাল পাহাড়ে। মন বলল—নিশ্চয়ই পথটা পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। আনন্দে এগোচ্ছি, এমন সময়—দমাস্।

আবার টায়ার বার্স্ট। অটো আবার পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। নীলমাধব দর্শন আজ আর হয়ে উঠবে না। রবি নির্বিকার। এটা ওর গুণ। ও নেমে

বলল—চিন্তা নেই। ব্যবস্থা করছি, আমরাও নামলাম। দুধারে ক্ষেত, দূরে, সামনে পাহাড় আর কিছু নেই। যেখানে অটোটা দাঁড় করিয়েছে দুটো পাকা দোকানঘর রয়েছে ঠিকই, কিন্তু দুটোরই ঝাঁপ ফেলা। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। শীতকাল আর মনে হচ্ছে না। খালি জায়গা পেয়ে সূর্যকিরণ সরাসরি নেমে এসে তাতিয়ে তুলেছে এলাকাটা। সঙ্গীদের যে খিদে পেয়েছে এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। দেখলাম তারা এই বন্ধ দোকানঘরগুলোর ছায়ায় গিয়ে বসল, মুখ ব্যাজার। রবি আর ভাইগ্না ফাটা টায়ার খুলছে রাস্তায় বসে।

আমি কি করি? সঙ্গীদের পাশে গিয়ে বসলাম। দু-এক কথা পেড়ে বুঝলাম তাদের কথা বলার ইচ্ছে নেই। পথ দুর্ঘটনার জন্যই হোক আর খিদের জন্যই হোক। আমি কি করবো, আমিও থম্ মেরে বসে রইলাম। রবি আর ভাইগ্না চাকাটা খুলে গড়াতে গড়াতে যে দিক থেকে এসেছিলাম, সেইদিকেই চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে। বিরক্ত সঙ্গীদের পাশে বসে বিরক্ত বোধ করলাম। আমিও উঠে পাহাড়গুলোর দিকে হাঁটতে থাকলাম। বেশ খানিক যাবার পর মনে হল, যেটা কাছে ভাবছিলাম সেটা হাঁটা দূরত্বে নয়। আমি যত এগোতে থাকি, যেন পথটা তত লম্বা হয়ে পাহাড়টাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। নাঃ। হন্টনাভিযানে ক্ষান্তি দিয়ে আমি আবার সঙ্গীদের কাছে ফিরলাম পায়ে পায়ে।

ওমা। ফিরে দেখি এতক্ষণ যে জায়গাটা জনমনুষ্যবিহীন বলে ভাবছিলাম, সেটা তা নয়। কোথা থেকে জনা ছয়েক লোক ও দুটো বাচ্চা আমার সঙ্গীদুটোর পাশে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে।

আসলে আমরা শহরবাসীরা এমন গ্রামগঞ্জে এলে ভাবি এখানে মানুষজন বিরল। বা বুঝতে পারি না যে এখানকার অধিবাসীরা আমাদের ঠিক লক্ষ্য করছে, তা আমরা তাদের যতই না দেখতে পাই। অটো বিগড়ে দুটো অচেনা লোক পথের ধারে বসে আছে দেখেই এই গ্রামবাসীরা এসে জুটেছে। কবি, সাহিত্যিকরা গ্রামবাসীদের যতই সরল বলে ব্যাখ্যা দিন না কেন, আমি দেখেছি এদের কৌতূহল প্রচণ্ড বেশি। ভাষা না বুঝলেও এই লোকগুলো এসে রীতিমতো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে। কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাচ্ছিলাম? এত রাস্তা অটোতে করে কেন যাচ্ছিলাম? অটো যার সে কোথায় গেল? ইত্যাদি।

আমি এসব ফালতু কথায় থাকি না।

আমি লোকগুলোকে একটু আপাদমস্তক দেখে নিলাম। আমাদের অটো খারাপ হয়েছে বলে বাচ্চাদুটো যে খুব আনন্দিত হয়েছে সেও বুঝলাম। গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়ে হুশ্ হুশ্ করে গাড়িগুলো চলে যায়। কেউ দাঁড়ায় না। এবার কেমন জব্দ? মুখে যেন সেই ভাব বাচ্চা দুটোর। একটা লোক সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। সাইকেলের পিছনের কেরিয়ারে দুটো বিশাল হাঁড়ি দড়ি দিয়ে বাঁধা, একটার ওপরে একটা চাপানো। সাইকেলের দুই হ্যান্ডেলে দুটো নাইলনের থলে।

আমার কেমন সন্দেহ হল।

লোকটাকে প্রশ্ন করলাম—হ্যাঁ গো। তোমার ওই হাঁড়িতে কি আছে?

লোকটা বলল—দই বড়া, খাবে?

এ যেন না চাইতেই জল। খিদেটা আমার পেয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী খিদে ভোলার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু এমন অড স্থানে এভাবে মুখরোচক খাবার পেয়ে যাবো, এ ভাবিনি কখনো। খিদেটা হঠাৎ যেন ফিরে এল বিস্মরণের গুহা থেকে। দই বড়ার নাম শুনে আমার সঙ্গীদুটোর মুখেও যেন চিকনাই দেখা দিল।

আমি বললাম—দাও, দাও। কত করে দাম?

লোকটা বলল—পাঁচ টাকা, প্লেট।

অবিশ্বাস্য।

লোকটা নাইলনের ব্যাগ থেকে তিনটে বড় শালপাতার বাটি বের করে পেছনের হাঁড়ি থেকে প্রত্যেক প্লেটে আটটা করে বড়া রাখল। ওমা এতো সে বড়া নয়। ছোট ছোট, গোল গোল। তারপর তলার হাঁড়ি থেকে হাতা করে ঘোলা একটা জল বাটিগুলোতে দিয়ে পরিবেশন করল।

আমার সঙ্গী বলে উঠল—একী? এটা দইবড়া নাকি?

আমি ততক্ষণে মুখে দিয়ে ফেলেছি।

না। এ আমাদের চেনা দইবড়া নয়। তবে অনবদ্য এর স্বাদ। কলাই-এর ডালের বড়ার উপর দই-এর জল সঙ্গে মশলা দিয়ে অপূর্ব সমীকরণ।

অগতিতে পড়ে আমার সঙ্গীদ্বয় দেখলাম নাকমুখ সিটকে কোনোমতে বাটি দুটো শেষ করল। তবু আমি বললাম—দেখছো তো পথের দুর্গতি। কখন গিয়ে পৌঁছাবো, পথে আর কিছু পাবো কিনা, কিচ্ছু ঠিক নেই। আরও এক বাটি করে খাও।

ওরা মুখ বেঁকিয়ে বলল—না, না। এ আবার দই বড়া নাকি?

আমি সংকোচ করলাম না। বড়াওয়ালার থেকে আরও দুবাটি বড়া উদরস্থ করলাম। দাম মেটালাম। ততক্ষণে দেখি রবি,

ভাইগনা, আর একটা ছেলে এল, সঙ্গে নতুন টায়ার। এসেই তারা রাস্তায় বসে চাকা লাগাতে লাগল।

ওদের দেখে বা ওদের মুখে ওড়িয়া ভাষা শুনে গ্রামবাসীগুলো দেখলাম আস্তে আস্তে সব সরে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি রেডি।

আমরা আবার রওনা দিলাম।

রবি এবার খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে লাগল। স্বভাবতই স্পিড্ একেবারে ঢিমে। মুখে বলল—আর তাড়াহুড়ো করা চলবে না। এবারে চাকা গেলে আর কিছুই করার নেই।

এবারে পথদৃশ্যও আর আমার ধৈর্য রাখতে পারল না। মটরচালিত যানে বসে গরুচালিত যানের গতিতে কার ধৈর্য থাকে। আমি নিস্তেজ হয়ে বসে রইলাম।

প্রায় দুঘণ্টা-আড়াইঘণ্টা চলার পর রবি মুখ খুলল—আর দশ কিলোমিটার।

আমি নড়ে চড়ে বসলাম।

যাক্। এসেই গেছি তাহলে। এখন চাকা গেলেও হেঁটে দেখে নিতে পারবো শ্রীনীলমাধবকে। চাকা গেল না। নির্বিবাদেই আমরা কন্টিলো জনপদে ঢুকলাম। সেল ফোনের ঘড়িতে দেখলাম আড়াইটে বাজে। অটো গিয়ে যেখানে দাঁড়ালো, নেমে চোখকে মেনে নিতে পারছিলাম না।

একটা বিশাল জলাশয়। তার চারদিকে দূরে পর্বতশ্রেণী যেন জলাশয়টাকে ঘিরে আগলে রেখেছে। আর জলাশয়ের মধ্যে মধ্যে অসংখ্য বালির দ্বীপ। রাস্তার একপাশে সার দিয়ে দোকান। ঠাকুরের ফটো, মালা ও নানা ধর্মীয় সামগ্রী বিক্রির পসরা। নয়নাভিরাম দৃশ্য ছেড়ে রবিকে বললাম—খাবার দোকান কোথায়?

আমার জন্য নয়। উদ্দেশ্য এই সঙ্গীদের ভাতের জোগান দিতেই হবে। কলকাতায় এতক্ষণে এরা ভাত ঘুমে থাকে।

রবিও ব্যাপারটা বুঝে চলে গেল। খানিকবাদে ঘুরে এসে বলল—ভাত সব দোকানে শেষ।

আমি বললাম—কিচ্ছু নেই।

রবি বলল—আছে বড়া আর তরকারি।

একটা দোকানে ঢুকে তাই খেলাম। খাওয়ালাম। আমার ব্যাপার কিছুতেই কিছু নয়। কিন্তু সঙ্গী দুজন যে অসন্তুষ্টতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা তাদের মুখমণ্ডলই বলে দিচ্ছিল।

খাওয়া শেষ করে হোটেলের বাইরে আসতেই রবি আরেক দুঃসংবাদ দিল।

বলল—এই রাস্তাটা শেষ হলেই পাহাড়। ছোট্ট পাহাড়। তার মাথায় মন্দির। কিন্তু মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। বিকাল চারটায় খুলবে। ঘড়ি দেখলাম। তিনটে বাজে। এখনো একঘণ্টা।

আমরা স্থির করলাম ঠিক আছে, চারটে অবধি এদিক ওদিক ঘুরবো।

আমি রবিকে বললাম—ঝিলের পাড় দিয়ে পাহাড়ের দিকেই যাই চলো।

রবি বলল—ঝিল কোথায়? ওটা মহানদী।

চমকে উঠলাম। নদীর এমন হ্রদের মতো বিস্তার, আমি কখনো দেখিনি। প্রাণ ভরে দেখতে দেখতে পাহাড়ের দিকে এগোলাম। পাহাড়ের পাদদেশ অবধি পৌঁছলাম, পাঁচজন। সামনেই ছোট্ট তোরণ, তোরণ পেরোলে সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। মন্দিরের শ্বেতশুভ্র চূড়াও দেখা যাচ্ছে। মনে মনে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামরত নীলমাধবকে প্রণাম ও আমাদের উপস্থিতির কথা জানালাম।

খেয়াল করিনি, আমাদের পেছন পেছন একটা বাচ্চা ছেলে আসছে।

ন-দশ বছরের ছেলেটা ওড়িয়া ভাষায় কিছু বলছিল। আমি ভেবেছিলাম পয়সা চাইছে বোধহয়। আমি রবিকে বললাম—ওকে কিছু দিয়ে বিদায় দাও। বিরক্ত করতে বারণ করো।

রবি বলল—ও পয়সা চাইছে না। আমাদের নৌকা করে মহানদীতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে। চল না, সময়টাতো কাটাতে হবে।

আমি বললাম—তা মন্দ হয় না। তা কত নেবে বলছে?

রবি বলল—চল্লিশ টাকা। ওই দ্বীপটা অবধি নিয়ে যাবে।

আমার ভরসা হলো না। ছেলেটার বয়স নেহাৎ কম। তাছাড়া নৌকা কই?

সে কথা বলতেই ছেলেটা বলল—নৌকা আছে, ভালো নৌকা। আমার সাথে এসো।

কি আছে, কি নেই গিয়েই দেখা যাক। রাস্তা ছেড়ে ঢাল বেয়ে ছেলেটা নামল নদীর পাড়ে। সত্যিই দুটো নৌকা রয়েছে। ফাইবারের তৈরি। একটা সাদা, একটা হলদে। গায়ে O.T.D.C. লেখা। গভর্মেন্টের নৌকা।

ছেলেটি বলল—সরকার থেকে এখানে জলযাত্রার ব্যবস্থা

করেছে। নৌকাগুলো দিয়েছে। আমাদের স্থানীয় ছেলে ক'জন এই করে রুজি পাই।

নৌবিহারের আনন্দোপভোগ, সময় কাটানো এবং ছেলেটির প্রতি সহানুভূতিতে অবশেষে নৌকায় উঠলাম সবাই। কিন্তু প্রচণ্ড রৌদ্রে বেশ কষ্টই হচ্ছিল। ছেলেটি জল বাইতে বাইতে বেশ কায়দার সাথে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের একটা বালুচরের দিকে।

খানিক যেতেই প্রকৃতির মনোলোভা রূপ দেখতে পেলাম। সত্যিই এখানে ভগবান কেন ডেরা বেঁধেছেন উপলব্ধি করলাম। চারিদিকে জল আর জলের প্রান্তে পাহাড়শ্রেণী। ছোট ছোট বালিয়াড়িতে ভরা সমস্ত জলরাশিতে। নৌকা খানিকটা এগোতেই নীল পর্বত ভালো করে দেখতে পেলাম। যার মাথায় অনেকগুলো সাদা মন্দিরের চূড়া। সবচেয়ে বড়টির গর্ভগৃহেই যে কলির আদি দেবতা নীলমাধব বিরাজ করছেন তাতে সন্দেহ নেই। অপলক দৃষ্টিতে শোভা নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।

সাত কি দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ছেলেটি পৌঁছে দিল বালির চরটায়।

চরে নেমে সত্যিই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। চারিদিকে পাহাড় আর জল। ছোট একটা বালুচরে আমরা ছ'জন। মনে হল পৃথিবীতে আমরা এই কজন ছাড়া আর বোধহয় কিছু নেই। বিভোর হয়ে গেছিলাম। এমন সময় রবি বলল—স্নান করবে?

কথাটায় বিভোরতা কাটল।

—স্নান? করতে তো ইচ্ছে করছে, কিন্তু জামা প্যান্ট পরে কি করে স্নান করবো?

রবি মুচকি হেসে নৌকার কাছে গিয়ে একটা গামছা বের করে আনল। প্রখর রৌদ্রে শরীরটা সত্যিই জলের পিপাসা বোধ করছিল। গামছাটা দেখে আর সুস্থির থাকতে পারলাম না। গামছা পরে প্যান্ট ছেড়ে জলে নামলাম। এক কোমরও জল নয়। বলে জলকেলি করতে লাগলাম মনের সুখে। সুশীতল আরামদায়ক স্বচ্ছ জল। শরীর মন যেন পবিত্র হয়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ জল ঘেঁটে উঠলাম। আমার সঙ্গী দুটো বিরক্ত মুখে একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের স্নানের জন্য বললাম। তারা তো আকাশ থেকে পড়ল। এমন জায়গায় কি স্নান করা যায়? ভাবটা এমন পৃথিবীতে কিছু ব্যক্তি আছে যারা স্নান না করে থাকতে পারে। বুঝলাম এরা সেই ধাতের। ওদের আর ঘাঁটালাম না। প্রচণ্ড বেগে হাওয়া দিচ্ছিল। আমি তাতেই জামা ও চুল শুকোতে লাগলাম। আমার থেকে গামছা নিয়ে রবি ও ভাইগ্‌না একে একে স্নান সারল। সাত-দশ মিনিটেই আমার সব কিছু শুকিয়ে গেল। আমি ক্যামেরা দিয়ে চারদিকের ছবি তুলতে লাগলাম। আমার এক সঙ্গী আমারও একটা ছবি তুলে দিল। প্রায় চারটে বাজতে যায়, কিন্তু এই দ্বীপ থেকে যেতে মন করছে না। দাঁড়িয়ে শুধু দেখেই যাচ্ছি চারপাশ।

হঠাৎ মাঝিবাচ্চাটি আমাদের তাড়া দিল তীরে ফেরার জন্য। ওর ঘণ্টায় চুক্তি, ভাবলাম তাই তাড়া দিচ্ছে। আমরা নৌকায় উঠে আবার তীরের দিকে রওনা দিলাম। আমার তখন চোখ আর মন ছেড়ে আসা সেই ছোট্ট বালুচরটার দিকে নিবদ্ধ।

কিন্তু একী? আমি দেখলাম সেই বালুচরটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। একসময় সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল জল প্লাবনে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—দ্যাখো-দ্যাখো বালুচরটা তলিয়ে গেল।

রবি হেসে বলল—আমরা যখন ওটার ওপর ছিলাম, তখনই জল বাড়ছিল। ছেলেটি বুঝতে পেরেই আমাদের তাড়া দিয়ে নৌকায় তুলল।

সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আজকে আমাদের আনন্দ দেবে বলেই হয়তো বালুচরটা জন্মেছিল। ক'দণ্ডের আনন্দ দিয়ে সে তলিয়ে গেল। এ নদীতে আবার কোথাও পরবর্তী সময়ে চর গজাবে। এখানের চরগুলো ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী। গজায়, ডুবে যায়। আমাদের চরটা আর কোনোদিনও গজাবে না। চিরতরে শেষ হয়ে গেছে সে। কিন্তু জীবনের একটা চরম স্মৃতির মুহূর্ত সে আমাদের দিয়ে গেল। মনে মনে বললাম—তুমি শেষ হওনি। আমার স্মৃতি হয়ে চিরকাল তুমি থাকবে। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম সেদিক থেকে।

পাড়ে পৌঁছে বাচ্চাটাকে পঞ্চাশটাকা দিলাম। ও দশটাকা ফেরত দিতে যাচ্ছিল, আমি নিলাম না। ওর মুখে একটা আনন্দরেখা ঝিলিক দিয়ে গেল। একটু আগের পাওয়া দুঃখটা ছেলেটার মুখের এই হাসিটায় ভুললাম। মাত্র দশ টাকায়, আমরা মানুষেরা কত স্বার্থপর।

তীরে এসেই আবার এগোলাম মন্দির তোরণের দিকে।

তোরণ পেরোতেই সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ে। উঠতে থাকলাম। বেশি সিঁড়ি নয়। তিন মিনিটেই পাহাড়ের ওপর মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলাম। ঘড়িতে তখন ঠিক চারটে পাঁচ।

মন্দির তখনও খোলেনি। দেবতার বৈকালিক শৃঙ্গার চলছে। এত রৌদ্রে মন্দির চত্বরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তার উপর

শ্বেতবর্ণের মন্দিরগুলোর দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমরা নাট্‌মন্দিরে ঢুকে বসলাম। পাথরের তৈরি নাটমন্দিরে আশ্চর্য শীতলতা ও স্নিগ্ধতা। মন জুড়িয়ে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নীলমাধবের কপাট উন্মোচিত হল। জয়ধ্বনি করে ফেললাম, নিজেরই অসাবধানতায়।

কি অপূর্ব রূপ। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম মন্দিরে কটা পাণ্ডা আর আমরা ছাড়া কেউ নেই।

পীত বসন, কপালে চন্দন, নাকের অগ্রাংশাবধি রসকলি, ফুলের সুসংযত মালা গলে শোভমান। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। প্রাণভরে দেখতে থাকলাম, শিহরিত হচ্ছিলাম।

ইন্দ্রদ্যুম্ন, শবররাজা ও বিদ্যাপতি এবং দেবাদিদেবাদি সমস্ত দেবগণ যাঁর দর্শনলাভের জন্য কোটি বৎসর অপেক্ষা করেছেন, সাধনা করেছেন তাঁর দর্শন মাত্র একদিনে আমি করতে পারছি জেনে মন অহংকারে ভরে উঠল। ভোর থেকে যে পথকষ্ট পেয়েছি তা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হতে লাগল। মন ভরে দেখলাম। তারপর মন্দির চত্বরে এসে অন্য মন্দিরগুলো দেখলাম।

জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা, বিরজা, বিমলা, ভুবনেশ্বরী, বিশ্বনাথ, সাক্ষীগোপাল, গণপতি সবাই রয়েছেন লীলারাজ নীলমাধবকে ঘিরে।

একবার পাঁচিলের ধারে গেলাম। পাহাড়ের মাথা থেকে মহানদীকে আবার দেখলাম। অপরূপ, অনবদ্য। সেই চরটা কোনখানে ছিল বোঝার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এখন সব জলে একাকার। এবার ফেরার পালা।

কতগুলো পাণ্ডা এসে ছেঁকে ধরলো। পূজা দেবার জন্য। আমি মন্দিরে পূজা দিই না। কোথাও না। শুধু দর্শন করি। সে কথা রবি জানে। রবি ক্ষান্ত করল পাণ্ডাদের। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। কতগুলো পাণ্ডা আশা নিয়ে পিছনে নামল আমাদের। কিন্তু লাভ নেই।

ঘুরে তাকালাম আবার মন্দিরের চূড়ার দিকে।

আবার যেন দেখতে পারি তোমায়। মনে মনে বললাম।

তোরণ পেরিয়ে রাস্তায় এসে দোকান থেকে নীলুর ফটো কিনলাম। এটাও আমার বাতিক। যেখানে যাবো, রেপ্লিকা হিসাবে স্মৃতিপট সংগ্রহ করব। আমার দেখাদেখি আমার এক সঙ্গীও একটা ফটো নিল। দাম মিটিয়ে অটোয় এসে উঠলাম।

রবি অটো স্টার্ট দিয়ে কন্টিলো জনপদ ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছাল। গাড়ির গতিবেগ প্রায় নেই বললেই চলে। হিসাব করছিলাম বাড়ি ফিরতে দশটা বেজে যাবে। তাই রবিকে বললাম স্পিড বাড়াতে।

রবি হেসে বলল—মা দখিনকালী দেখবে?

—দখিনকালী? সে আবার কোথায়?

রবি বলল—বেশি না এখান থেকে মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার। নয়াগড় বলে একটা শহর আছে, সেখানে মা দখিনকালী খুব জাগ্রত, মাত্র তিনশো টাকার তেল হলেই হবে, কারণ ফেরার সময় অন্য রাস্তায় ফিরবো কিনা। মাইলেজ একটু বেশি হয়ে যাবে।

মুহূর্তখানেক ভাবলাম। আবার কবে আসবো, কে জানে?

বললাম—'চলো'।

যে দিক দিয়ে এসেছিলাম, তার উল্টো দিকে গাড়ি দৌড়াল।

নয়াগড়ের মা দখিনকালী।

সেও এক অদ্ভুত সুন্দর ভ্রমণ ব্যাখ্যা। কিন্তু সে অন্য কাহিনি। পরে কখনো বলবোখন।

জয় নীলমাধব